প্রিয় শহরকে নতুন করে জানা

যুগশঙ্খ SUPPLI

কলকাতা

সোমবার, ৩ এপ্রিল ২০১৭

৮ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

শহরের বুকে ভুঁইফোঁড়ের মত যতই নতুন নতুন সিসিডি বা পার্ক গজিয়ে উঠুক না কেন, প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাছে বিকেলের গঙ্গার ঘাট চিরকালই পছন্দের। সূর্যের লাল আভা ক্রমশ ফিকে হতে হতে এই গঙ্গার পাড়ে বসেই পাল্টে যায় কত সম্পর্কের রঙ। তবে আজকের দিনে এই প্রেমালাপ এতোটাই শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়েছে যে গঙ্গার ধারে সাধারন মানুষের চোখ ফিরে তাকানোই দায়। তবে বিকেলে বাদাম চিবোতে চিবোতে গঙ্গার ঘাটের ফুরফুরে হাওয়া কেই-বা মিস করতে চায়...

ফোটো: **সুজয় চট্টোপাধ্যায়** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

আমার চোখে কলকাতা

প্রচেত গুপ্ত (সাহিত্যিক)

আমার কাছে কলকাতা, শুধু একটি শহর নয়। আমার কাছে কলকাতা কখনও আমার বন্ধু, কখনও আমার গুরুজন যে আমাকে স্নেহ করে। কখনও আমার প্রেমিকা যে আমাকে ভালোবাসে। কখনও আমার আপন প্রাণের বন্ধু, আমার দুঃখ কষ্টে যে আমাকে পাশে টেনে নেয়। কখনও আমার সমালোচক। যে কখনও কখনও ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকায়, বলে এটা ঠিক করছো না। কখনও সে আমায় আদর করে, কখনও আঘাত করে। কখনও সে আমাকে কল্পনায় ভেসে যেতে সাহায্য করে, কখনও সে আমাকে বাস্তবের মাটিতে টেনে এনে ফেলে।

আমি আমার লেখায় বার বার কলকাতাকে আনার চেষ্টা করেছি। আমি নিজে ছোটবেলাটা প্রায় মফস্বলে কাটিয়েছি। এখন অবশ্য সেটা কলকাতার মধ্যেই পড়ে। কিন্তু তখন আমি যেখানে ছিলাম সেটা আমার কাছে কলকাতা ছিল না। সেখানে অনেক মাঠ ছিল, বড় বড় জলাশয় ছিল। প্রচুর গাছ ছিল, পাখি ছিল, সন্ধ্যে ছিল, সকাল ছিল। আমার বাল্য কৈশোর আমি সেখানে কাটিয়েছি। তারপর যখন কলকাতায় কলেজে পড়তে এলাম এখন তো বারাসাত পর্যন্তই কলকাতা একদিকে আর অন্যদিকে কল্যাণী পর্যন্ত। আমি যখন কলকাতায় পড়ি তখন আমি খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম যে কলকাতায় যাচ্ছি। কোথায় কী পাবো, কীভাবে চলব, মানুষগুলো কেমন। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারব কি না, ঠগবাজের পাল্লায় পড়ব কিনা। কিন্তু তারপর যেতে যেতে যত দেখলাম তাতে দেখলাম যে সেই কলকাতা আসলে জীবনকে চেনায়। আমার কাছে কলকাতা এমন একটা জনপদ যে জীবনকে চেনায়। আমার শিক্ষা কলকাতায়, আমার প্রেম কলকাতায়, আমার সাহিত্যের প্রাঙ্গণ ও কলকাতায় অনেকটা জুড়েই। এখন আমি থাকি কলকাতা থেকে একটু সামান্য দূরে যার সঙ্গে কলকাতার চরিত্র মেলে না মোটেই। এখন আমি বলি যে আমি কলকাতায় যাচ্ছি। হয়ত ৫ মিনিটের মধ্যেই কলকাতা পুরসভা এলাকার মধ্যে ঢুকে যাই। কিন্তু আমি বলি আমি কলকাতা যাচ্ছি। কলকাতা

এরপর ছয়ের পাতায়

চলতে চলতে কলকাতা দেখা: এসপ্ল্যানেড টু গালিফ স্ট্রিট

নেপথ্যের নাখোদা মসজিদ

পান্থজন

একতলা থেকে তিনতলা— গোটা মসজিদ ঘুরে দেখতে সময় লাগল প্রায় একঘণ্টা। নাখোদা মসজিদের ছাদ থেকে কলকাতার কয়েকটি অংশকে দেখা এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। এবার জানা এবং শোনার পালা। ইমাম সাহেবের সঙ্গে সময় ঠিক করে আবারও নাখোদা মসজিদে যাওয়া হল। ইমাম সাহেবের কাছে শোনা গেল অতীতের অনেক কথা। এখন যে-মসজিদে আমরা বসে আছি, সেখানে আগে দুটো মসজিদ ছিল। সেগুলির সাল বা তারিখ কারওর জানা নেই। পুরনো দু'টি মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন রোশান হাক্কাক এবং সামসুন্নিসা বেগম। প্রতি জুম্মাবারে তৎকালীন মসজিদে ইসলাম ধর্মের বিষয় বক্তব্য রাখতেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পিতৃদেব মৌলানা খায়রুদ্দিন সাহেব। সেই সময় তাঁর অনুগামীরা একদিন প্রস্তাব করেন মধ্য কলকাতায় একটি বৃহৎ জামা মসজিদ স্থাপনের। অন্যান্য সদস্যরা ভেবে-চিন্তে বলেন যে, বিশেষ ওই দু'টি প্রাচীন মসজিদের দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা যদি দু'টি মসজিদকে আমাদের হাতে তুলে দেন, তাহলে এই জায়গায় আমরা একটি বড় মসজিদ তৈরি করতে পারি। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পরে পুরনো মসজিদ হস্তান্তরিত হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, জাকারিয়া স্ট্রিট থেকে তারাচাঁদ স্ট্রিট এবং রবীন্দ্র সরণির থেকে রাজমোহন স্ট্রিট পর্যন্ত বিস্তৃত যে অঞ্চল, সেখানেই হবে নতুন মসজিদটি।

সেই সময় মসজিদ লাগোয়া পাশের বাড়িটি ছিল অতীতের বিখ্যাত নটী ও নর্তকী গওহরজান-এর। কমিটির তরফ থেকে তাঁকে অনুরোধ করা হয় বাড়ি সহ জমিটি যেন তিনি মসজিদ নির্মাণের জন্য বিক্রি করেন। কিন্তু তিনি রাজি ছিলেন দান করতে। চেয়েছিলেন এই মহৎ উদ্যোগের শরিক হতে। কিন্তু ইসলাম ধর্মে শরিয়তের নিয়মানুযায়ী সেরকম কোনও দান গ্রহণ করা যায় না। মসজিদ নির্মাণে কোনও অর্থ গ্রহণ করা যাবে না নর্তকী বা বাইজির কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত গওহরবাইয়ের সাহায্য ছাড়াই মসজিদ

নির্মাণের কাজ শুরু হল। তিনতলা এই নাখোদা মসজিদ প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো। আগে এখানে বেশিরভাগই আরবের থেকে ইমামরা নিযুক্ত হতেন। নাখোদা মসজিদে নিযুক্ত বর্তমান ইমাম সাহেব, দ্বিতীয় ভারতীয় ইমাম। এর আগে মৌলানা সাবির সাহেব ছিলেন নাখোদা মসজিদের ইমাম। ২০০৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

মসজিদের বিশেষত্ব হল, এখানে কারুর মাজাহার মানে সমাধি থাকে না। এখানে ঈশ্বর নিরাকার। কোনও প্রতিকৃতি বা ছবি রেখে মসজিদে প্রার্থনা করার রেওয়াজ নেই। রবীন্দ্রনাথ যেমন নাখোদা মসজিদে এসেছিলেন, তেমনই এসেছিলেন গান্ধীজি, জওহরলাল নেহরু ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। এখানকার হলে বসেই তাঁরা একসময় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয় একাধিক সভাও

এরপর দুইয়ের পাতায়

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৩ এপ্রিল ২০১৭

জীবিকার সন্ধানে বুদ্ধিজীবীরা

রণজিৎ ভট্টাচার্য

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

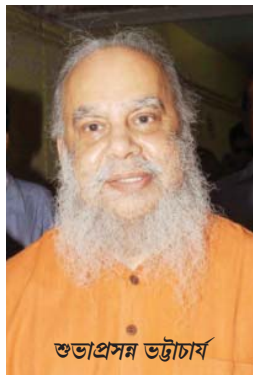
শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

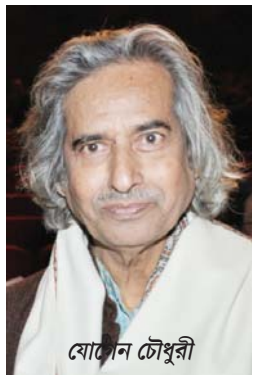
যোগেন চৌধুরী

তরুণ মজুমদার

অপর্ণা সেন

রাত্রি বসু

গুরুকুলে আচার্য একদিন পরীক্ষা নিলেন, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কে সাধারণ আর কে অসাধারণ! তিনি বললেন, আজ পূর্ণিমা, আকাশে চাঁদ উঠবে। তাই দেখে কার কী প্রতিক্রিয়া পরের দিন সকালে জানতে চাইবেন। রাতে আকাশে সেই চাঁদ দেখে একদল, লম্বা হাই তুলে ঘুমিয়ে পড়ল, আর অন্যদল খাতা-কলম খুলে বসল। তাদের মধ্যে কেউ কবিতা লিখল, কেউ ছবি আঁকল। পরের দিন সকালে আচার্য যারা ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদের সাধারণ আর যারা জেগে ছিল, যারা ওই জ্যোৎস্নার রাতে ভাবুক হয়ে কিছু সৃষ্টি করেছে, তাদের অভিহিত করলেন অসাধারণ বলে। সারা পৃথিবীর মানুষকেই এই দু'টি শাখায় ভাগ করা যায়, সাধারণ ও অসাধারণ। এই অসাধারণ মানুষদের একটি পোশাকি নাম আছে– বুদ্ধিজীবী। তাঁরা আর পাঁচটি মানুষের থেকে আলাদা। তাঁরা কেউ কবি, কেউ চিত্রশিল্পী, কেউ চিত্রপরিচালক, কেউ অভিনেতা, কেউ নৃত্যশিল্পী, কেউ নাট্যকার। এঁদের ভেতরের সৃজনশীলতাই এঁদের বুদ্ধিজীবী বা ইন্টেলেকচুয়াল করে তুলেছে। সম্প্রতি এমনই দুই কলকাতাবাসী বুদ্ধিজীবী মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাঁদের গল্পের বিষয় ছিল 'কলকাতার বুদ্ধিজীবী সমাজের অবস্থান'। সেই আলোচনার ভিত্তিতেই এই লেখা।

দুই প্রথিতযশা ব্যক্তির কথোপকথন থেকে জানা গেল বুদ্ধিজীবীরা আমাদের সমাজে আজ বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। বিগত ১০-১২ বছর ধরে বুদ্ধিজীবীদের একরকমের অরাজকতা চলেছে। এঁদের লোকেরা সন্দেহের চোখে দেখেন এবং সমাজে এঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, কেউ এঁদের বিশ্বাস করেন না। এঁরা নিজেদের ভাঁড়ে পরিণত করেছেন। সর্বস্তরে একটা অবনমন ঘটেছে, আর তার জন্য দায়ী এঁরাই। এমন বাক্যালাপ আমরা অনেকেই নিজেদের বসার ঘরে ধূমায়িত চা খেতে খেতে করে থাকি। কিন্তু কারণগুলি কোথায় লুকিয়ে, এসব কিসের ফলশ্রুতি, সেটা কি ভেবে দেখেছি?

'ইন্টেলেকচুয়াল' শব্দটির গোড়ায় রয়েছে 'ইন্টেলেক্ট' যার বাংলা আভিধানিক অর্থ, বিচার ও বোধশক্তি। আর 'ইন্টেলেকচুয়াল'-এর অর্থ সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন। 'ইন্টেলেক্ট' শব্দের অর্থ অক্সফোর্ড অভিধানের মতে, 'পাওয়ার অব ইউজিং ইওর মাইন্ড টু রিজন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং' আর 'ইন্টেলেকচুয়াল'-এর অর্থ 'আ পার্সন উইথ আ হাইলি ডেভেলপড ইন্টলেক্ট'। এঁদের কথা থেকেই বোঝা গেল এঁরা এঁদের অভিহিত করেছেন বুদ্ধিজীবী হিসাবে। অর্থাৎ সেই সব ব্যক্তি যাঁরা তাদের ইন্টেলেক্টকে জীবিকা করেছেন আর সেই জীবিকার স্বার্থে তাঁদের বিচার, বোধশক্তি, সদবৃত্তি সমস্ত ক্ষমতাশালীদের কাছে খুইয়ে বসেছেন। আর যখন জীবিকা তখন শুধু জীবনধারণের প্রয়োজন মেটানো নয়, আরও আরও আরও বেশির জন্য দৌড়তে গিয়ে বিচার-বুদ্ধি-স্বকীয়তা হারাতে হবে, এতে অবাক হবার কিছু নেই।

আলোচকরা সময়কাল ধরেছেন ১০-১১ বছর। হতেই পারে আরও বেশি কিছু সময় ধরে দেখা গেছে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর দল সরকারি প্রসাদ প্রাপ্তির আশায় শুধু কাছাকাছি এসেছেন তাই নয়, অন্যায়, অন্যায্য, নীতিহীন কাজেরও সমালোচনা-প্রতিবাদ করেননি। এঁদের অনেকেই আবার বর্তমানে ক্ষমতায় আসীন দলের কাছাকাছি থাকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বললে ভুল হবে, মুক্তকচ্ছ হয়ে উদ্বাহু নৃত্য করছেন। স্বাভাবিক কারণেই এঁরা সাধারণ মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছেন। মুশকিল হল এঁদের কারণে যাঁরা সত্যিকারের সদচিন্তা নিয়ে এগোতে চাইছেন তাঁদের প্রতিও অবিশ্বাস দেখা দিচ্ছে।

এর অন্য একটি কারণ হল, সমাজে কোনও তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য আদর্শ নেই। অতীতে আমরা যাঁদের দেখেছি তাঁদের কেউ কেউ এখনও বেঁচে আছেন, যেমন শঙ্খ ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, এমন আরও অনেকে একটা আদর্শকে সামনে রেখে, তাকে প্রতিষ্ঠার জন্য সারাটা জীবন কাজ করে গেছেন এবং সেটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ নিরপেক্ষভাবে। আজকের ভাষায় এঁরা 'নির্বোধ', 'বার খাওয়া পাবলিক'। সমস্ত বোধের আকরসম্পন্ন বুদ্ধি বিক্রেতারা তাঁদের বিচার বিবেচনা বন্ধক রেখে, বেশি মুনাফার জন্য জমায়েত হচ্ছেন এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কেউকেটা হয়েও যাচ্ছেন। কিন্তু মার খাচ্ছে নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা, নতুন সমাজ গড়ার পরিকল্পনা। কিন্তু সেটা কি বাতিল হবার? সমাজে উৎপাদন-বণ্টনের সম্পর্কের সমতা কি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, না, এ অবস্থায় হওয়া সম্ভব? যদিও ধরে নিই বিগত শতকের ধ্যান-ধারণা, সমাজ বিবর্তনের প্রক্রিয়া সব 'ভুল প্রমাণিত' হয়ে গেছে, কিন্তু তাহলেও তো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে নতুন চিন্তা, নতুন প্রক্রিয়ার সন্ধান করতেই হবে। সাধারণ জনগণের জন্য সমবণ্টনের ব্যবস্থার স্বার্থে কাজ তো চালিয়ে যেতেই হবে। আর সেই কাজও কিন্তু বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন সদবৃত্তির লোকেদেরই করতে হবে কোনও আশু লাভের আশা না রেখেই।

জীবিকা অর্জনের সুযোগ বজায় রাখার পরিকল্পনা থেকে অনেকটাই দূরে গিয়ে। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা সদবৃত্তির লোকেদের জন্য সর্বদা সাধারণ মানুষেরাই করেছেন। এ প্রসঙ্গে অনেকদিন আগে শোনা একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। উত্তর ভারতের হিমালয়ের একজন সাধুর আশ্রমে হিংস্র পশু তার শাবকদের সকালে ছেড়ে যেতেই তারা দৌড়ে সাধুর ধূনির পাশে কম্বলের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, সারা দিনান্তে সেই মা পশু ডাকলে শাবকরা আবার বেড়িয়ে চলে যাচ্ছে তাদের আস্তানায়। আর সারাদিনের শেষে গ্রামের লোকেরা সাধ্যমতো আটা, জোয়ার-বাজরা পৌঁছে দিচ্ছে সাধুবাবার ক্ষুণ্নিবৃত্তির জন্য, কারণ তিনি কখনওই কিছু চাইতে যান না। তাই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার দায় নিয়েছেন নীচের গ্রামীণ মানুষ। এটাই ভারতীয় আদর্শ। এটা হয়তো আধ্যাত্মিক কারণে কিন্তু রাজনৈতিক কারণে বা সমাজ সংস্কারকদের সম্পর্কেও এমন ঘটনার অভাব নেই। বুদ্ধিজীবীদের কোনও অমুকজীবী বা তমুকজীবী হবার প্রয়োজন নেই সৎ প্রচেষ্টার জন্য।

TEAM কলকাতা

শর্মিলা চন্দ্র
(কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর)
তন্ময় মণ্ডল (সাব-এডিটর)
সালমা আহমেদ | **সুদীপ্ত বিশ্বাস**
অতনু পাল (ফোটোগ্রাফার)

চলতে চলতে কলকাতা দেখা: প্রথম পাতার পর

করেছেন। এমনকী মসজিদের উন্নতিসাধনের জন্য দেশবরেণ্য নেতারা মতামতও পোষণ করতেন। আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ইমাম সাহেব জানালেন, ২৪ ঘণ্টায় পাঁচবার নমাজ আদা করার নিয়ম রয়েছে ইসলাম ধর্মে। প্রতি শুক্রবার অর্থাৎ জুম্মাবারে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। ইদ-উল-ফিতার ও ইদুজ্জোহার মতো পবিত্র উৎসব শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়। মহরমের দিন মূল অনুষ্ঠানের পরে হয় বয়ান মানে, ইসলাম ধর্মের সারমর্ম এবং ইসলামি শিক্ষাকে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়। বলা হয় লাঠি, তলোয়ার ইত্যাদি নিয়ে প্রকাশ্য স্থানে ঘোরা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ। নাখোদা মসজিদ কোরানের এই শিক্ষাকে মেনে চললেও, আমরা কিন্তু শহরের রাস্তায় অন্য ছবিই দেখতে অভ্যস্ত। রমজান মাসে এখানে রাতে বিশ রাকাগ নমাজ পড়ার রীতি আছে, যা তেরাবি নামে পরিচিত। গোটা রমজান মাস ধরেই এটা চলে।

চিৎপুরে অবস্থিত কলকাতার বৃহত্তম মসজিদ ঘোরাও হল আর ইতিহাসও জানা হল। অনেক কিছু বোঝা গেল ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে। ধর্মনিরপেক্ষ দেশের এক অঙ্গরাজ্যের মহানগরীতে পথ চলতে চলতে মনে হল, যেখানে হিন্দু-মুসলমানের এমন সুন্দর সহাবস্থান, সেখানে আজও এত অহেতুক সমস্যা আর অশান্তি কেন? সব ধর্মই তো শান্তির বার্তা প্রচার করে। আপাতত সব চিন্তা সরিয়ে রেখে আমার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার পালা। বাদ্যযন্ত্র, প্রসাধন, সুগন্ধি, প্রার্থনাস্থলের পরে এবার খাদ্যের সুঘ্রাণ পাচ্ছি বলে মনে হল। শাস্ত্রে বলেছে 'ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনং'। কিন্তু তার আগে আরও একটি ছোট্ট দ্রব্যের কথা বলে আজকের পালা সাঙ্গ করব।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে উলটো ফুটে সোনার জিনিস ঝুলছে মনে করে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু না, এ অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতো, আসলে সোনা নয়। কোনও এক বিশেষ ধাতুর ওপর সোনার প্লেটিং করা। জিজ্ঞেস করতে জানা গেল এটি চিন দেশ থেকে তৈরি হয়ে আসে। প্রধানত অবাঙালিরা তাদের ঘরে রাখে, যাতে নজর না লাগে। এই চায়না মাল দেখতে অনেকটা আমাদের চাঁদমালার মতো। যাই হোক, আপাতত চিকেন চপের গন্ধে জিভে জল, তাই নজর না লাগার জিনিস থেকে নজর চলে যাচ্ছে সেই দিকে। আগামি পর্বে একটু খাওয়া-দাওয়ার গল্প হবে।

ফোটো: লেখক

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৩ এপ্রিল ২০১৭

মেস বৃত্তান্ত

কৃষ্ণগোপাল রায়

‘মেস শব্দটির বাংলা হয়নি। মেস-ই বাংলা হয়ে গেছে। আসলে মেস-এর ধারণাটাই বাংলা বা ভারতবর্ষে ছিল না। মুসলমান শাসনকালে ‘লঙ্গরখানা’ ছিল। কিন্তু লঙ্গরখানায় খাবার ব্যবস্থা থাকলে থাকার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ধর্মীয় পরিসরে এতিমখানা ছিল, তা অনেকটাই মেসের মতো ব্যবস্থা। কিন্তু অনাথরাই সেখানে স্থান পেত। মেসকে তাই এতিমখানা বলা যায়নি। আগে আগে প্রাচীন ভারতবর্ষে তপোবন ব্যবস্থায় পরবর্তী কালের টোল-চতুষ্পাঠীতে খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা অনেকটা মেসের মতো হলেও সেসব স্থানে কেবল বিদ্যার্থীরাই থাকতে পেত, মাদ্রাসাতেও তাই। মেসের ধারণা এনেছিল ইংরেজরাই, তাই বাঙালিরা যখন থেকে প্রথাগতভাবে ইংরেজি শিখতে শুরু করেছে, তার বহু আগেই মেস জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল, এদেশে। তাই পরবর্তীকালে এর বাংলার তর্জমা করতে খুব বেশি আগ্রহ দেখানো হয়নি।

কলকাতায় মেস-এর শুরু সম্ভবত রাইটার্স বিল্ডিংয়েই। ১৯৭৭-এ নির্মিত দ্বিতল ও অনতিবৃহৎ সেই বিল্ডিংয়ের একতলায় বসত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনতান্ত্রিক অফিস, যারা সেই অফিসে কাজ করত তাদেরই বলা হত রাইটার্স, এখন এরাই কেরানি। তখন তাদের বেতন ছিল ৪ থেকে ৯ টাকা। সেকালের পক্ষেও এ বেতন বেশি নয়। সুতরাং রাইটার্সকে চলতে হতো বেশ হিসেব করেই। তাদের সকলের বয়স ছিল অল্প, লেখাপড়া কেউ বেশি জানত না, ইংল্যান্ডে যারা কিছু করতে পারত না, তারাই এই স্বল্প বেতনের লোভে, সুদূর ভারতবর্ষে আসার জাহাজে চেপে বসত। এরা অবশ্য শৃঙ্খলিত জীবন-যাপন করত না। ইন্টারলোপিং এবং আরও নানা অসৎ উপায়ে, অর্থোপার্জন করত। কিন্তু সব পয়সা উড়িয়ে দিত, ফুটানি করে আর মদ খেয়ে। যাইহোক রাইটার্সের দোতলায়, এদের খাওয়া-থাকার যে ব্যবস্থা ছিল, তাকেই বলা হতো মেস।

একসঙ্গে প্রস্তুত একই জাতীয় খাবার, একই টেবিলে খাওয়া একই ধরনের ঘরে, একই ধরনের শয্যায় শোয়ার ব্যবস্থাকে বলা হতো মেস। স্বভাবতই খাওয়া-দাওয়া বাইরে বেরোনো ও ফিরে আসা, শোয়া ও ঘুম থেকে ওঠার একটা নিয়ম থাকত এখানে, যাতে সকলের সুবিধে হয়। এই খাওয়া-দাওয়া, থাকার জন্য পয়সা মেটাতে হতো, সপ্তাহ বা মাসান্তে।

নগরায়নের পথে কলকাতার দ্রুত পরিবর্তনের সময় মফস্সল থেকে যারা প্রতিদিন দল বেঁধে উঠে আসত, তাদের মধ্যে যারা গায়ে-গতরে খেটে, অর্থোপার্জন করত, অর্থাৎ যারা নিতান্ত শ্রমিক, তখনকার ভাষায় ‘কুলি’ তারা সস্তা ব্যবস্থার খোঁজে গিয়ে জুটত বস্তিতে, কিন্তু যারা অফিসে-আদালতে লেখালিখি বা হিসেবপত্রের কাজ করত অর্থাৎ যারা মধ্যবিত্ত, যাদের সংখ্যা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ক্রমশ বাড়তে থাকে, তারাও কলকাতায় বহিরাগত হলে মেসে থাকত। মেসের মতো তবু তার চেয়ে, কিছু উন্নত ব্যবস্থা ছিল, ‘বোর্ডিং হাউস’। বোর্ডিং-এ আলাদা ঘর পাওয়া যেত, স্বভাবতই সেখানে নিজের জামা-কাপড় বিছানাপত্র, অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বা টাকা-পয়সা অনেক বেশি সুরক্ষিত। বেরোনোর সময় ঘরে তালা দিয়ে যাওয়া হতো। মেস-এ সেটা সম্ভব ছিল না। সেখানে একই ঘরে, তিন চারজন থাকত বলে, কেউই তার ঘরে তালা দিতে পারত না, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র কিছু বাক্সে পুরে রাখতে হত। কিছু বাইরের নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে বলে সহবাসীদের বিশ্বাস করে। বোর্ডিংয়ে খাট ও চৌকির ব্যবস্থা থাকত, মেসে চৌকি থাকলেও তা ছোট, অনেক মেসে চৌকি থাকত না। মেঝেতেই বিছানা পাতা হতো, বেরোনোর সময় তা রোল করে পাট করে রাখা হতো দেওয়াল সেঁটে। বোর্ডিং-এ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খাবার পৌঁছত ঘরে, মেসে একটা ঘরের মেঝেয় আসন পেতে খেতে হতো। উভয় ক্ষেত্রেই রান্নার জন্য, কেনাকাটা বা ঘরদোর পরিষ্কার করার জন্য, বামুন-চাকর বা দাসী থাকত। এই রান্নার কাজ নিয়ে কলকাতায় এসেছিল বহুসংখ্যক উড়িয়া। দাসীর কাজ করতে সাধারণত অসহায় বিধবারা। অসহায় বলেই, সকলের মুখ ঝামটা শুনেও তারা কাজ ছেড়ে যেতে পারত না।

কলকাতায় রেল চলাচল শুরু হয়, সিপাহি বিদ্রোহের বছর– ১৮৫৭ তে। কলকাতায় যারাই আসত, দূরের পথ বলতে নদী, সময়সাপেক্ষ ছিল যাওয়া আসা। তারকনাথের ‘স্বর্ণলতা’ নায়ক কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় এসেছিল পায়ে হেঁটে। সততই যাওয়া আসাটা তখন বেশ বড় ব্যাপার। তাই কলকাতায় চাকরি বা অন্য কাজ করার জন্য সে সময় যারা আসত তারা সপ্তাহান্তে বাড়ি যাওয়া কথা ভাবত না, মাসান্তেও নয়, সাধারণত ছুটি-ছাটাতেই বাড়ি যাওয়া সম্ভব হতো। অন্যদিকে ভদ্রাসনের প্রতি তাদের ছিল খুব টান। পরিবার নিয়ে কলকাতায় পাকাপাকিভাবে চলে আসার দিন তখনও আসেনি। তখন যারা আসত তারা ধনী, যেমন মাইকেলের পিতা রাজনারায়ণ। তবে এক্ষেত্রে গ্রামের বাড়িতে বয়োজ্যেষ্ঠরা অখুশি হতেন। গ্রামে যাদের নিজস্ব বিষয়-সম্পত্তি, তেমন কিছু ছিল না, ভদ্রাসন ত্যাগে তাদের বাধা ছিল কম। বাকিরা কলকাতায় আসত শুধু কাজের জন্য, এবং ছুটি পেলেই বাড়ি যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত। বাড়ির জন্য বিশেষত স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের জন্য মন খুশি করার জিনিসপত্র কেনার ব্যস্ততা পড়ে যেত, ছুটির কদিন আগে থেকেই। ‘বায়না অগ্রেতে দিয়া/আয়না লইল গিয়া/যায়না তাহার শোভা বলা/লইল গোলাপি মিসি, ইচছা হয় তারে মিশি, আর কত পানের মশলা/ ঘুনসি প্রেমের ফাঁসি/লইল রাশি রাশি /যাহে ভালোবাসিবেক প্রিয়া/ নিল মালা কত মত, কামিনী মনমতো/হারে হার যাহারে হেরিয়া।’

কেবল প্রিয়জনদের শখের জিনিস নয়, যে শহর থেকে বাড়ি ফেরার জন্য, মন আজ ব্যাকুল, গ্রামবাসীদের কাছে সেই শহর জীবনের গৌরব দেখানোর আগ্রহও কম ছিল না। ‘মনে মনে বড় সাধ/কাঁদিয়া মোহন ফাঁদ/দেশে গিয়া থাকিবেন বাবু/কালা পেড়ে ধুতি পরা, দাঁতে মিসি গাল ভরা/ঠোঁট রাঙা তাম্বুলের জলে/গোড়াগাবি জুতো পায়, রঙিন ম্রেজাই গায়/কোৎকা হোৎকা সব চলে।’

প্রাত্যহিক জীবনে যে বিশ্বাস করতে পারে না অর্থের টান, গ্রামে সেই বিলাসই দেখাবে যাতে সবাই ভাবে, শহরে তারা এমনই সুখে আছে। অপরের কাছে নিজেকে স্বচ্ছল ও অর্থবান প্রতিপন্ন করার এই বিচিত্র ধনতন্ত্রে গভীর ব্যাধি। অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্যকেই শ্রদ্ধেয় বলে দাবি। ধনতন্ত্রের কাছে মানুষের আত্মসমর্পণ। উনিশ শতকের আগে বাঙালির মনে, এই আকুতি ছিল না। যার ধন ছিল সে বিলাস করেছে, অপরে তাকে সম্মান করেছে, কিন্তু ধনী হওয়ার জন সকলে ব্যাকুল হয়নি।

বিবদমান শহরের কেরানিকূল জানত তাদের অর্থসাধ্য, জানত মাসের থেকে দেরি বা কামাইয়ের জরিমানা দিয়ে (রবীন্দ্রনাথের ‘বাঁশি’ কবিতার, হরিপদ কেরানির কথা স্মরণীয়) হাতে যা পাওয়া যাবে, খুব বুঝে সুখে না চালালেও বাড়িতে পাঠানোর জন্য উদ্বৃত্ত কিছুই থাকবে না। বস্তুত ঘরে যাদের জমি বিরেত কিছু ছিল না, তাদের পক্ষে কেরানির চাকরি করে সংসার প্রতিপালন করা ছিল দুঃসাধ্য।

টাকার অভাবেই তারা পরিবার আনতে পারত না কলকাতায় ও নিজেদেরও থাকতে হত সস্তার মেসে। মেস-বাস তখনকার অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা। সুতরাং ‘বিদেশি কলমপেষা সকলের এক নেশা/ পরস্পর কয় এই কথা, চাকুরির মুখে ছাই/ পাখী হয়ে উড়ে যাই, নিবাসে রমণী মনি যথা।’

নিতান্ত ক্ষোভের কথা, চাকুরির মুখে ছাই দেওয়ার ক্ষমতা, কারও ছিল না। উনিশ শতকের যে ইতিহাস আমরা পড়ি, তাতে বড় মানুষের বিভালোক চাপা পড়ে এই নিম্ন মধ্যবিত্তের কৃচ্ছ্রতা। সাহিত্যেও তার বিশেষ প্রতিফলন নেই। কারণ এ সময়ের যাঁরা কথাকার, তাঁরা অধিকাংশই এদের শরিক নন, তাছাড়া তাঁদের রচনাদর্শের অভিমুখও ছিল ভিন্ন।

কেরানিকুলের পর আরও যারা মেস বাড়িতে থাকতে এল তারা ছাত্র। সাধারণত কলেজের ছাত্র। অবস্থাপন্ন ঘরের ছাত্ররা থাকত বোর্ডিংয়ে, অনেকে ‘গোরা’র বিনয়ের মতো স্বতন্ত্র বাড়ি ভাড়া করে, ভৃত্য নিয়ে থাকত। শরৎচন্দ্রের সতীশ থাকত মেসে, সেটাও সম্পন্নদের, আর দেবদাসের আস্তানা বিনয়ের চেয়ে কম সুবিধাসম্পন্ন ছিল না। আসলে সে সময় যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য, শহরে আসত তারা অধিকাংশ সম্পন্ন পরিবারের। তবে অনেক দরিদ্র সন্তানও জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, আধুনিক শিক্ষাকে অবলম্বন করে। নবীনচন্দ্র সেন কলকাতায় পড়তে আসার সময়, দরিদ্র ছিলেন না, কিন্তু বাবার ক্রমবর্ধমান ঋণ এবং অকাল মৃত্যু তাঁকে দারিদ্র্যের অকুল সাগরে ভাসিয়েছিল। আগে থেকেই তিনি ২০ টাকার টিউশন করতেন। বাড়ির জন্য আরও ২০ টাকা উপায়ের খোঁজে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। লড়াকু ছাত্রদের ছিল এক অবলম্বন– কলেজের শেষে বা সকালে তারা টিউশন করত। কলেজ পাস করার পরও এরা মেসে থাকত, চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত। এরকম একজনের জবানবন্দি এইরকম:

‘মেসে অনেকদিন ধরিয়া আছি, তাই নিতান্ত তাড়াইয়া দেয় না, কিন্তু তাগাদার উপর তাগাদা দিয়া মেসের ম্যানেজার অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। মেসে প্রতিমা গড়াইয়া পুজো (সরস্বতী) হইতেছে, ধূমধামও মন্দ নয়। সকলে উঠিয়া ভাবিতেছে, আজ সব বন্ধ, দু-একটা জায়গায় একটু আশা দিয়েছিল, তা আজ কোথাও যাওয়া কোনও কাজের হইবে না, বরং তার চেয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াই।

মেসের চাকর জগন্নাথ এক সময় এক টুকরো কাগজ হাতে দিয়া চলিয়া গেল। পড়িয়া দেখিলাম ম্যানেজারের লেখা তাগাদার চিঠি। আজ মেসে পুজো উপলক্ষে, ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমার কাছে দু-মাসের টাকা বাকি, আমি যেন চাকরের হাতে, অন্তত দশটি টাকা দিই। অন্যথা কাল হইতে, খাওয়াদাওয়ার জন্য আমাকে অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সবাই বুঝেছেন এ বর্ণনা ‘আরণ্যক’-এর এবং এটাও বোঝা যাচ্ছে, এ মেসের আবাসিকদের অর্থাবস্থা নানা রকমের। তাতে সত্য চরণের মতো, ছাত্র পরে মাস্টার, তারপর কর্মহীন বেকার যেমন থাকে তেমনি সম্পন্নরাও থাকে, যারা পুজোর অর্থ যোগায়, ভালো খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনে উৎসাহী হয়। ম্যানেজার চাকর নিয়ে মেসের সম্পন্নতাও আভাসিত হচ্ছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি

এরপর সাতের পাতায়

‘গোরা’র বিনয় স্বতন্ত্র বাড়ি ভাড়া করে, ভৃত্য নিয়ে থাকত। শরৎচন্দ্রের সতীশ থাকত মেসে, আর দেবদাসের আস্তানা বিনয়ের চেয়ে কম সুবিধাসম্পন্ন ছিল না। আসলে সে সময় যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য, শহরে আসত তারা অধিকাংশ সম্পন্ন পরিবারের।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ৩ এপ্রিল ২০১৭

গরম না এসি, কে বেশি বিপজ্জনক

সংযুক্তা ঘোষ

খড়খড়ি, কড়িবরগা এই শব্দগুলো বর্তমান প্রজন্মের কাছে প্রায় অজানাই বলা যায়। সদ্য টিন-এজ পেরোনো যুবক-যুবতীরা হয়তো-বা এর নাম শুনেছেন, কেউ কেউ হয়তো দু-একবার চোখে দেখেছেন বটে। অনেকে মনে করতে পারবেন, আবার অনেকে পারবেন না। তবে কলকাতার পুরনো বাসিন্দা হলে অবশ্য কোথাও না কোথাও এসব দেখে থাকবেন। কেউ আবার দেখেছেন, কিন্তু তার নাম জানেন না। কারণ ক্রমশই এই শব্দগুলো হারিয়ে যাচ্ছে কলকাতা থেকে। যারা মনে করতে চেষ্টা করছেন তাদের বলি, এগুলো আসলে পুরনো বাড়ির এক-একটা অংশের নাম। ব্রিটিশ আমলে তৈরি বাড়ি যে কটা অবশিষ্ট আছে সেখানে গেলে এসব এখনও চোখে পড়বে। বাড়ি ঠান্ডা রাখতে বেশ কিছু প্রযুক্তি ব্যবহার করা হত। এখন অবশ্য সেই সব পুরনো বাড়ি ভেঙে আকাশচুম্বী ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে। বাড়ি ঠান্ডা করতে এখন এয়ারকন্ডিশন নামক যন্ত্রের জুড়ি মেলা ভার। প্রাকৃতিক আরামের তুলনায় যান্ত্রিক আরামই এখন আমাদের কাম্য।

এদিকে বিশ্ব উষ্ণায়নের জোয়ারে গা ভাসিয়েছে বিশ্বের সমস্ত উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ। উষ্ণায়ন সামাল দিতে আন্তর্জাতিক স্তরে যতই তাবড় তাবড় সম্মেলন হোক না কেন, আদপে ভিতরে ভিতরে কিন্তু সব দেশই উন্নয়নের মোড়কে বিশ্ব উষ্ণায়নকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। যার ফলে প্রশ্ন থেকেই যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে কি কোনও সচেতনতা এসেছে? নাকি নিজের স্বাচ্ছন্দই ক্রমবর্ধমানভাবে আমাদের কাছে সবকিছু হয়ে উঠছে। বলা যায় কিছুটা জেনে শুনেই আমরা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়ে যাচ্ছি। যার ফলস্বরূপ,

'দারুণ অগ্নিবাণে রে, হৃদয় তৃষায় হানে রে।
রজনী নিদ্রাহীন, দীর্ঘ দগ্ধ দিন,
আরাম নাহি যে জানে রে।'

এই পরিস্থিতি আরও প্রখর থেকে প্রখর হয়ে চলেছে। কলকাতাও এর থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। একদিকে গরমের হাত থেকে বাঁচতে এয়ারকন্ডিশন (এসি) বা এয়ার কুলারের মতো যন্ত্রগুলিকে হাতিয়ার করে চলেছি আমরা। অন্যদিকে এসব আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহারে কলকাতা হয়ে উঠছে আরও উষ্ণ। বাংলার ছয়টি ঋতু এখন শিশুপাঠ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বসন্তের রং গাছের পাতায় লাগতে না লাগতেই স্পষ্ট হয়ে যায় গ্রীষ্মের হুঙ্কার। তাহলে গেল কোথায় বসন্তকাল? না ঠান্ডা না গরমের সেই মন ভালো করে দেওয়া আবহাওয়া। যার জন্য সারা বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকে কলকাতার জনগণ এবং প্রকৃতি। বেমালুম উধাও হয়ে গেল নাকি? হ্যাঁ, তাই হয়ে গেল বটে! বিশ্ব উষ্ণায়নের আশীর্বাদে আজ বাংলার বুক থেকে বিদায় নিতে বসেছে বসন্তকাল। মুছে যাচ্ছে তার ছাপ। সবুজ-সতেজ-নতুন-নবীনতার প্রতীকী ঋতু আজ মুখ ঢেকেছে প্রখর তপন তাপের অন্তরালে। হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় ঋতুগুলি।

একসময় কলকাতার বাড়িগুলিতে ছিল মোটা মোটা উঁচু দেওয়াল, কড়িবরগা দিয়ে তৈরি। পাশাপাশি বাড়িগুলো এমনভাবে ছিল যাতে হাওয়া-বাতাসের অভাব ছিল না। কড়িবরগা হল মোটা কাঠের ফ্রেকের উপর মাটির টালি বসিয়ে বসিয়ে ছাদ তৈরি করা। যাতে ঘর ঠান্ডা থাকে। মাটির টালি সূর্যের তাপ প্রতিফলিত করতে সাহায্য করত। আগেকার দিনের ঘরগুলির জানালায় থাকত কাঠের খড়খড়ি। যাতে জানালা বন্ধ থাকলেও ঘরের মধ্যে হাওয়া-বাতাস খেলতে পারে। ঘর বদ্ধ না লাগে। লোকসংখ্যা ছিল কম, দূষণ ছিল কম। ফলে প্যাচপ্যাচে গরমের প্রভাব সেভাবে ছিল না। ক্রমশ সেই কলকাতার পুরনো বাড়িগুলো বদলে গেল ৫ ইঞ্চি বা ১০ ইঞ্চি দেওয়াল দেওয়া ফ্ল্যাটে। দেওয়ালে একটু রোদ পড়লেই গরমে ঘরে টেকা দায়, সারাদিনের ক্লান্তি ঘোচাতে অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যা থেকেই ঘরে চলতে থাকল এসি। যার গরম হাওয়া পাশের ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে ঢুকে সেই ঘরকেও গরম করে তুলছে। সেই গরম থেকে বাঁচতে পাশের ফ্ল্যাটের পরিবারটিকেও এসি-র দ্বারস্থ হতে হচ্ছে।

মাত্রাতিরিক্ত গরম ঠেকাতে এভাবেই মানুষ মুড়িমুড়কির মতো কিনে নিচ্ছে এসি বা এয়ার কুলার। সাধ্য থাকলে স্বস্তি পেতে কেই-বা না চায় বলুন। আর এই এয়ার কন্ডিশনারে বিপদ এক আধটা নয়, সহস্র। তাদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল দ্রুত তাপমাত্রা কমে যাওয়ার পদ্ধতি। ঘরের দেওয়ালের ওপারের তাপমাত্রা যখন পঁয়ত্রিশ বা তার বেশি, দেওয়ালের এপারে তখন বাইশ বা তার কম। এই পঁয়ত্রিশ থেকে বাইশে নামতে তার লেগেছে মোটে দশ মিনিট। মানুষের শরীর তাতে স্বস্তি পেলেও যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে যাচ্ছে শরীরের ভেতরে। আবার অফিসে এই তাপমাত্রা থেকে হঠাৎ বাইরে বের হলে সান স্ট্রোক বা হিট স্ট্রোকের কবলে পড়তে হচ্ছে। আমাদের শরীর তাপমাত্রার এই মারাত্মক ওঠা-নামাকে সইতে না পেরে প্রায়শই সর্দি-জ্বরের মুখে পড়ে। অবস্থার অবনতি হলে তা নিউমোনিয়ার দিকেও মোড় নিতে পারে।

আবার দীর্ঘ সময় এসি ঘরে থাকতে থাকতে সর্দি-কাশি, হাঁপানি বা অ্যাজমা জাতীয় বিভিন্ন ক্রনিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ। তাঁদের মতানুযায়ী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে যেহেতু কোনও ক্রস ভেন্টিলেশন থাকে না, তাই সেই ঘরের মানুষগুলির নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঘরের ভেতরেই ক্রমাগত সংবাহিত হতে থাকে। এসি-র আরও বড় সমস্যা হল একটু একটু করে শরীরের জল শুষে নেওয়া। এমনকী শরীর থেকে অতিরিক্ত জল টেনে নিলে রক্তসঞ্চালনেও ব্যাঘাত ঘটে।

সময়ের সাথে সাথে কলকাতা শহর যত চাকচিক্যময় ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, পুরনো অট্টালিকা হয়ে উঠেছে একালের স্কাইলাইন অ্যাপার্টমেন্ট। বর্তমান প্রজন্ম নিজেদের বসবাসের সুবিধার্থে সেই পৈত্রিক একান্নবর্তী পরিবারের ভিটেখানা সযত্নে তুলে দিয়েছে কোনও প্রোমোটারের হাতে। তারা মোটা টাকার বিনিময়ে সেই বাড়ি নিমেষে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে সেই জমিতে খাড়া করে দিয়েছে দশ-বিশতলা বিল্ডিং। প্রতি তলায় তিনটে-চারটে করে ফ্ল্যাট। তাতে জমির পরিধি কিন্তু বাড়ল না, কিন্তু বাসযোগ্য হয়ে উঠল কয়েকশো জনের। আর চারপাশের গাছপালা কেটে উড়িয়ে দিয়ে তৈরি হল জিম, পুকুর বুজিয়ে সুইমিং পুল আর অবশিষ্ট বাগান হয়ে গেল বাস্কেটবল কোর্ট বা প্লে গ্রাউন্ড। কাজেই একদিকে যেমন এভাবে পরিবেশের উষ্ণতা বাড়ল তেমনই আধুনিক যন্ত্রপাতির দৌলতেও বাড়তে থাকল উষ্ণতা।

আদিম যুগের কিছু ঘরবাড়ি কপালজোরে রয়ে গিয়েছে মধ্য ও উত্তর কলকাতার আনাচে-কানাচে। কিন্তু তাতে বসবাস করে হাতে গোনা পরিবার। সেখানেও অবশ্য ইনভার্টারের কাছে কবেই হার মেনে নিয়েছে হ্যারিকেন বা হ্যাজাক, আর সিলিং ফ্যানের ঘড় ঘড় শব্দ ম্লান করে আরাম যোগাচ্ছে এয়ার কন্ডিশনার। এর কুফলগুলি ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। কিন্তু এখনই যদি সতর্ক না হওয়া যায় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা আরও আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

আমরা কি কৃত্রিমতা ছেড়ে একটু প্রকৃতিক স্বাচ্ছন্দের খোঁজ করতে পারি না? তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও আমরা একটা দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারব। আর তারাও কড়বরগা বা খড়খড়ি জানালা কি তা জানতে ডিকশনারির দ্বারস্থ হবে না। কলকাতা আধুনিকতার সাথে সাথেই তার ঐতিহ্যকেও বয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

নতুন মুখ

কলকাতায় জন্ম। পাঠভবন স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি নাটকে অভিনয় শুরু। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আগ্রহেই মূলত নাটকে যোগদান। ক্লাস ইলেভেনে স্কুলের অনুষ্ঠানে তাঁর অভিনয় দেখে প্রখ্যাত অভিনেতা কাঞ্চন দাশগুপ্ত প্রশংসা করেন। তিনি সন্দীপকে পেশাদারি অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করেন। সন্দীপ ভট্টাচার্যের নিজের আগ্রহ তো ছিলই। সেই আগ্রহই তাঁকে জায়গা করে দিল দূরদর্শনের পর্দায়। টক শো দিয়ে শুরু, সঙ্গে সঞ্চালনার কাজও চলতে থাকল। স্টার জলসা চ্যানেলে 'কেয়ার করি না' শীর্ষক টিভি সিরিয়ালে অভিনয়ের সুযোগও মিলল। এরপর বহু কাজ করেছেন। বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থার মডেলিং-এ। অধ্যাবসায় এবং আগ্রহ তাঁকে সুযোগ করে দিয়েছে চলচ্চিত্র জগতে। আপাতত ঋতব্রত ভট্টাচার্যের 'ছকবাজ' ছবির শুটিং-এ ব্যস্ত রয়েছেন। একই সঙ্গে কাজ করছেন 'শপিং মল.কম', 'পাগলা সাহেবের খবর' ইত্যাদি ছবিতে। আগামিদিনে কাজ করতে চলেছেন কয়েকটি ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনায়। ছবি এবং মঞ্চে আরও উন্নমানের কাজ করতে আশাবাদী নবীন অভিনেতা সন্দীপ ভট্টাচার্য।

৫
কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৩ এপ্রিল ২০১৭

বিষণ্ণ দুপুরের ভীমপলশ্রী

অরিজিৎ মৈত্র

ভরা গ্রীষ্মের দুপুর, চলন্ত শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসের জানালা দিয়ে গরম বাতাস এসে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে দিচ্ছে। বোলপুর থেকে কলকাতার পথে সামারের লু উপেক্ষা করে ট্রেন ছুটে চলেছে। হঠাৎই গাড়ির গতি কমে আসে। একসময় থেমেও যায়। গাড়ির গতি রোধ হলেও সময়ের গতি এগিয়ে চলে নিজের নিয়মে। খবর আসে বর্ধমান স্টেশনে অবরোধ চলছে। গাড়ি কখন ছাড়বে ঠিক নেই। বেগতিক দেখে, রেললাইন ধরে সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে চলা। এইভাবে কি কলকাতা পৌঁছনো যাবে! নাহ্, ক্লান্তিতে থামতে হয় বর্ধমান স্টেশনে এসে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি বর্ধমানের খোসবাগানে থেকে যাব বাবার বাল্যবন্ধুর বাড়ি। তাঁর তোলা অজস্র সাদা-কালো ছবির হাতছানি, সঙ্গে সেতার আর কণ্ঠে বড়ে গুলাম আলি খান সাহেবের ঠুমরি 'মোরে ন্যায়না'। এইভাবেই কেটে যাবে আজকের রাতটা। হ্যাঁ, ঠিক সেই ভাবেই পার হয়ে গিয়েছিল, সেদিনের দুপুর, বিকেল আর রাত।

আজও আরেক গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন। নাহ্, ভুল করছি, চৈত্রমাসের এখনও পনেরোদিন বাকি। আজ কোনও অবরোধ নেই, আছে শুধু কর্মহীন দুপুরবেলার বিরক্তি। সঙ্গে আগ্রাসী ক্লান্তি। আকাশবাণীর এফএম চ্যানেলের সুর কানে আসে। পুরুষ কণ্ঠের এক মিষ্টি আলাপ ভীমপলশ্রী রাগে। 'এ গুণ গায়ে তরসোয়া'। দুপুরের এই রাগটি বড় সুন্দর, কিন্তু একই সঙ্গে বুকের কোথাও মোচড় দেয়, সচেতন করে দেয় একাকীত্ব সম্পর্কে। অবচেতন মনে কোনও বিশেষ একটি মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে, একটি নাম ঝলক দিয়ে ওঠে মনের অন্ধকারে। ভালো লাগার সেই মুহূর্তে দূরত্ব অসহ্য লাগে। তাই কি পূর্ণেন্দু পত্রী লিখেছিলেন, 'ফুলের গন্ধে ফোটার জন্য, নারীর স্পর্শ পাবার জন্য, বুকের মধ্যে কান্না দিয়ে আমরা যেদিন যুবক হলাম, বাইরে তখন বক্ষে বৃক্ষে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, আমাদের সেই কান্না নিয়ে গান ধরেছে বড়ে গুলাম। ফুলের কাছে, নারীর কাছে, বুকের বিপুল ব্যথার কাছে, বেদনাবহ যে সব কথা বলতে গিয়ে ব্যর্থ হলাম, তারাই দেখি ফিরে আসে কেউ ললিতে কেউ বিভাসে, স্পন্দনে তার বুঝতে পারি বুকের মধ্যে বড়ে গুলাম'?

শুনেছি মিঞা তানসেনের গানে নাকি আকাশ থেকে বৃষ্টি নেমে ধরিত্রীকে স্নিগ্ধ করত। কখনও আবার মাটির বুক থেকে আগুন জ্বলে উঠত। আর আমার এই মনকেমন করা দুপুরে, ভারতীয় মার্গসংগীতের প্রবাদপ্রতিম কণ্ঠসংগীত শিল্পী উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খানের গায়কি আমায় বিরহী করে তুলেছে। মন গুনগুনিয়ে উঠছে 'কা করু সাজনি আয়ে না বলাম'।

শিল্পী এই শহরের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। অনেক বিখ্যাত সংগীতশিল্পী তাঁর কাছে তালিম নিয়েছিলেন, যাঁর মধ্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, গুলাম আলি পুত্র মুনাব্বর আলির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত অর্থেই শিল্পী ছিলেন বিশ্বনাগরিক। জন্ম ১৯০২ সালের ২ এপ্রিল অবিভক্ত ভারতের পঞ্জাব প্রদেশের কাসৌরে। দেশভাগের পরে পাকাপাকিভাবে চলে আসেন ভারতে, মহারাষ্ট্রের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের ব্যবস্থাপনায় বসবাস করতে শুরু করেন বোম্বেতে। এরপর সুরের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান লাহোর, হায়দরাবাদ, কলকাতা। পাতিয়ালা ঘরানার শিল্পী পাঁচ বছর বয়স থেকে সংগীতশিক্ষা শুরু করেন মামা উস্তাদ কালে খানের কাছে। এরপরে গান শেখেন বাবা উস্তাদ আলি বক্স খানের তত্ত্বাবধানে, যিনি ছিলেন কাসৌর ঘরানার এক বিখ্যাত কণ্ঠসংগীত শিল্পী। খেয়াল বা ধ্রুপদের সময়সাপেক্ষ দীর্ঘ আলাপ বিস্তারে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। মনে করতেন সংক্ষিপ্ত খেয়াল এবং ঠুমরি শ্রোতাদের আনন্দ দেয় অনেক বেশি। শিল্পী পরিবেশিত রাগে প্রকাশ পেত পাতিয়ালা-কাসৌর ঘরানার সংযোগ।

শুনেছি সুরের মানুষ বড়ে গুলাম নাকি দিনে প্রচুর পরিমাণে ডিম খেতেন। ভাবতে অবাক লাগে ওইরকম মেদযুক্ত শরীর নিয়ে কীভাবে বিস্ময় জাগানো কণ্ঠস্বরে গান গাইতেন 'ইয়াদ পিয়া কি আয়'। চলচ্চিত্রেও গান গেয়েছেন। বাংলায় 'বসন্ত বাহার' ছবির গানের কথা আগেই বলেছি। ১৯৬০ সালে পঞ্চাশ হাজার টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে 'মুঘল-এ আজম' ছবিতে সোহিনী এবং রাগেশ্রী রাগে মাত্র দুটি গান গেয়েছিলেন। পদ্মভূষণ সহ আরও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু উপাধি বা সম্মাননা দিয়ে তাঁর মতো শিল্পীর বিচার করা ধৃষ্টতা।

কী অদ্ভুত, আবারও সেই শীতের এক বিষণ্ণ দুপুর, তপন সিংহের কাছে শুনলাম যখন তাঁর মনের ক্যারাভ্যান চলেছিল কলকাতা শহরের পথে-ঘাটে, সেই সময় স্মৃতিতে জেগে উঠেছিল একটি ঘটনা, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দিনগুলোতে কলকাতা যখন অন্ধকার অর্থাৎ শহরজুড়ে ব্ল্যাকআউট চলছে, তখন শহরের কোনও এক প্রেক্ষাগৃহে তাঁর গাওয়া 'হরি ওম তৎসৎ'-এর মধ্য দিয়ে পুবাকাশ রাঙা হয়ে উঠত।

বুকে বেদন তোলা এই ভীমপলশ্রীর জন্যই বোধহয় দুপুরগুলো বিষণ্ণ হয়। সেই কোনও এক বিষণ্ণ দুপুরে ফুরিয়ে যাওয়া আমার বিরহী মনের কথা লুকনো রইল মনের কৌটরে, যার খবর কেউ জানবে না, সযত্নে লেখা হবে না অনাবিল কাহিনির পাতায়।

সচেতন পাঠক সিদ্ধান্ত বদলাচ্ছেন
তাই তো রোজ বাড়ছে পাঠক সংখ্যা
যুগশঙ্খ
খবরের কাগজ, গল্পের নয়

রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দফতরের ওয়েবসাইট

- **রাজ্য সরকার**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (www.banglarmukh.com)
- **পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর**, জেসপ বিল্ডিং, ৬৩ এন এস রোড, কলকাতা-১ (www.wbprd.nic.in)
- **অর্থ দফতর**, নবান্ন, হাওড়া -৭১১১০২ (www.wbfin.nic.in)
- **স্বাস্থ্য দফতর**, স্বাস্থ্য ভবন, জিএন-২৯, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (www.wbhealth.gov.in)
- **পরিবেশ দফতর** (www.enviswb.gov.in)
- **পূর্ত দফতর** (www.pwdwb.in)
- **পরিবহন দফতর**, পরিবহন ভবন, ১২ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-১ (www.vahan.wb.nic.in)
- **কৃষি দফতর**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (www.wbagrisnet.gov.in)
- **সেচ দফতর**, জলসম্পদ ভবন, ব্লক-ডিএফ, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (www.wbiwd.gov.in)
- **সমবায় দফতর** (নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, কলকাতা-১ (www.coopwb.org)
- **মৎস্য দফতর**, ৩১, ব্লক-জিএন, সেক্টর-৫, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (www.wbfisheries.gov.in)
- **প্রাণী সম্পদ দফতর**, এলবি-২, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (www.wbard.gov.in)
- **খাদ্য দফতর**, খাদ্য ভবন, ১১এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৮৭ (www.wbfood.gov.in)
- **শিক্ষা দফতর**, বিকাশ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (www.wbsed.gov.in)
- **তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (www.tathyabangla.gov.in)
- **যুব কল্যাণ দফতর**, ৩২/১ বিবিডি বাগ (সাউথ), স্ট্যান্ডার্ড বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-১ (www.wbyouthservices.in)
- **নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দফতর**, বিকাশ ভবন, নর্থ ব্লক, দশম তল, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (www.wbsc.gov.in)
- **বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর** (www.wbdma.gov.in)
- **ক্ষুদ্র শিল্প দফতর** (www.mssewb.org)
- **বিদ্যুৎ দফতর**, বিদ্যুৎ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (www.wbpower.nic.in)
- **অচিরাচরিত শক্তি দফতর**, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, কলকাতা-১ (www.wbreda.org)
- **সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর**, অম্বর, ডিডি-২৭/ই, সেক্টর ১, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (www.wbmdfc.org)
- **অনগ্রসর কল্যাণ দফতর**, প্রশাসনিক ভবন, এসডিও বিধাননগর, চতুর্থ তল, ডিজে-৪, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (www.anagrasarkalyan.gov.in)

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ৩ এপ্রিল ২০১৭

আমার চোখে কলকাতা

প্রথম পাতার পর

যে আমাকে কোনওদিন খুব বেশি আপন করেছে এমন নয় আবার দূরে ঠেলেছে এমনটাও নয়। কলকাতা তার চরিত্রে, মননে, ভাবনায়, কলকাতা তার সাহিত্যে, কবিতায় ছবিতে কলকাতা সবসময় মনে হয় একটা চিত্রপটের মতো আমার সঙ্গে কোনও না কোনও সময় থেকে গেছে।

খুব বাস্তব অনেক কিছু দেখেছি কলকাতার রাস্তায়। দারিদ্র্য দেখেছি, প্রতিবাদ দেখেছি। বৈভব দেখেছি, নগরের সমস্যা দেখেছি নগরায়ণের দূষণ দেখেছি, আবার আমি দেখেছি একজন আরেকজনের দিকে কীভাবে হাত বাড়িয়ে দেয়। একে অপরকে ভালোবাসা। অসম্ভব ভালো কবিতা দেখেছি কলকাতার পথে। কলেজ স্ট্রিট জুড়ে বই দেখেছি। কফি হাউস দেখেছি। প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো কলেজ দেখেছি। চওড়া পথ, ভোরবেলা দেখেছি। ট্রামের ঘড়ঘড় শব্দ শুনতাম, রাত দুটো পর্যন্ত ট্রামের আওয়াজ, ঘুমই হতো না। পরে বুঝেছি ট্রামের আওয়াজ কত কঠিন ও কত মধুময়। সব মিলিয়ে কলকাতা আমার কাছে একটা ছবির মতো যা একই সঙ্গে আনন্দের খানিকটা বিষাদেরও বটে। কষ্ট দেখেছি তো, হারিয়ে যাওয়া মানুষ দেখেছি। সারা পৃথিবীর মধ্যে আমি মনে করি সেরা শহর হচ্ছে কলকাতা। যদি কলকাতা ঠিক মতো পর্যটন করা যায় তবে মানুষ অবশ্যই কলকাতার কাছে আসবে।

ঘাটের কথা @ কলকাতা

ইতিহাসের গর্ভে তিন ঘাট

নীহারিকা

এখন দাঁড়িয়ে আছি স্ট্র্যান্ড রোডে। সূর্য মধ্যগগনে, ইংরেজিতে যাকে বলে স্করচিং সান, সেই সানের তেজ এখন ক্রমশ বাড়ছে। পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গার তীরে থেকেও কোনও আরাম পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমানে প্রকৃতি বোধহয় ঘড়ি ধরে কাজ করে না। তাই বসন্তকাল হলেও মনে হচ্ছে গ্রীষ্মের প্রথম। আগের দিন চাঁদপাল ঘাটের ইতিহাস শুনিয়ে শেষ করেছিলাম। আজ স্ট্র্যান্ড রোড ধরে হাওড়া স্টেশনের দিকে হাঁটা দেব। যাওয়ার পথে নিশ্চয়ই পড়বে আরও কয়েকটি ঘাট। আসলে প্রাচীন এই শহরটার গায় ঔপনিবেশিক ছাপটা কিছুটা হলেও রয়ে গিয়েছে। লন্ডন শহরে টেমস নদীর পাশে রয়েছে কোভেন গার্ডেনস, আর তার পাশ দিয়েই নদী বরাবর চলে গিয়েছে স্ট্র্যান্ড। সম্ভবত সেই নামের অনুকরণেই কলকাতায় হুগলি নদীর পার ধরে যে-রাস্তা এগিয়ে গেছে, সেটারও নামকরণ স্ট্র্যান্ড রোড রেখেছিলেন ব্রিটিশ শাসকেরা।

চাঁদপাল ঘাটকে বাঁয়ে রেখে নাক বরাবর এগোলে চোখে পড়বে সরকারি উদ্যোগে সৌন্দর্যায়িত গঙ্গাতীর। মাঝে রয়েছে মিলেনিয়াম পার্ক। কিন্তু কোথায় গেল মতি শীল ঘাট? কয়লা ঘাট? কিংবা ফেয়ারলি ঘাট যার পুরাতন পরিচয় ওল্ড ফোর্ট ঘাট। যত এগোই, ততই দেখি হরেকরকম গাছ দিয়ে সাজানো

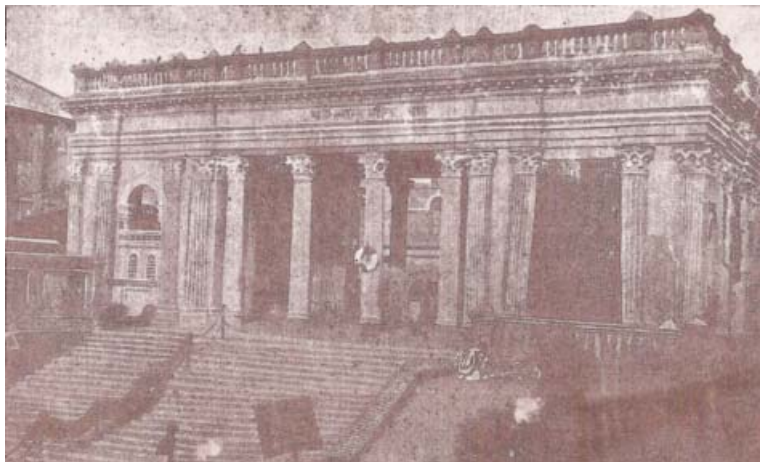

সৌন্দর্যায়িত গঙ্গার পার। কিন্তু সোনার কেল্লার রেললাইনটা যেমন উধাও হয়ে গিয়েছিল, তেমনই উধাও হয়ে গেছে প্রাচীন এই ঘাটগুলি নাকি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে? আর্মেনিয়ান ঘাটের দক্ষিণে শহরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মতি শীল নামাঙ্কিত ঘাটটি নির্মিত হয়েছিল বাবু মতি শীলেরই উদ্যোগে। ইতিহাস বলে ঔপনিবেশিক রাজত্বে অনেকগুলি হিন্দু ঘাট ধ্বংস করে তৈরি হয়েছিল স্ট্র্যান্ড রোড। সেই কারণে হিন্দু সমাজের অন্যতম অগ্রগণ্য ব্যক্তি মতি শীল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র হীরালাল শীল এই মামলায় জয়লাভ করেন। মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ পান পোর্ট কমিশনের কাছ থেকে। মতি শীল ঘাটে একসময় হিন্দু রীতিনীতির অনেক নিয়ম পালিত হতো। সেন্ট টমাস চার্চের বিপরীতে এই ঘাট আজ লুপ্তপ্রায়।

ভূগোলের নিয়ম অনুসারে, এরপরেই কয়লা ঘাট। নামটা মনে এলেই মনে হয় রেলের টিকিট বুকিং কাউন্টারের কথা। এমন এক অদ্ভুত নামের কারণ কী? আবার ইতিহাসের শরণাপন্ন হই। সম্ভবত ১৮৪২ সালে এই ঘাট নির্মিত হয়। ঘাটের পাশেই ছিল কয়লার গুদাম। রেলের স্টিম ইঞ্জিন এবং জাহাজে ব্যবহারের জন্য এইসব কয়লা ব্যবহৃত হতো। দু'টি ঘাটের পারেই তৈরি হয়েছে বর্তমান মিলেনিয়াম পার্ক। পরের গন্তব্য ফেয়ারলি ফেরিঘাট।

আগেই বলেছি এই ঘাটের পুরাতন নাম ছিল ওল্ড ফোর্ট ঘাট। ফেয়ারলি জেটি থেকে বর্তমানে হাওড়া স্টেশন যাবার লঞ্চ ছাড়ে। অতীতে এই ঘাটের অস্তিত্ব ছিল ডালহৌসি স্কোয়ারের লালদিঘির কাছে। এখন যেখানে কলকাতার জেনারেল পোস্ট অফিস মানে জিপিও, সেখানেই ঘাটের পাশ দিয়ে বয়ে যেত গঙ্গা। কথিত আছে, এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাটটিই নাকি কলকাতাকে কেল্লা, বন্দর, এবং প্যালেসের শহর হিসাবে পরিচিত করে। সেই সময় কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসা বিভিন্ন জাহাজ এই ঘাটের কাছেই নোঙর করত। চক্ররেলের লাইন পেরিয়ে এগিয়ে যাই গঙ্গার তীরে। দিনটা রবিবার, তাই সারকুলার রেলের স্টেশনে নিস্তব্ধতা। কোথাও কোনও ব্যস্ততা নেই। ঘাটে কয়েকজন নিশ্চিন্ত মনে স্নান করছেন। এই ঘাট থেকে অনায়াসেই চোখে পড়ে বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রসেতু। জলের দিকে দৃষ্টি গেলে দেখা যায় ভাটার টানে ভেসে যাচ্ছে কত আবর্জনা। এর পাশে ঘাট সংলগ্ন বট, অশ্বত্থ গাছগুলি অলসভাবে দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে।

এমনই আরও অনেক ইতিহাসের কথা লুকিয়ে রয়েছে গঙ্গার অন্তরে। বর্তমান জীবনের ব্যস্ততায় সেই ইতিহাস সলিল গর্ভে কিনা জানি না, তবে কুসুমের সঙ্গে আমদের সন্ধান চলতে থাকবে। আগামী পর্বে অন্য ঘাটের গল্প।

বেতার @ কলকাতা

কবিগুরুর বীণাপাণি

মনীষা ভট্টাচার্য

পর্ব: তিন

'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ, তেমনি করে গাও গো, আজ যেমন করে চাইছে আকাশ তেমনি করে চাও গো, আজ যেমন করে...' কবিগুরুর দাবি আকাশ গায়, আকাশ চায়, কিন্তু কীভাবে? পাখিরা আকাশে ওড়ে, তাদের কণ্ঠে গান থাকে, তাহলে পাখিদের গানই কী আকাশের গান! যদি তা ধরেও নিই, তাহলে দ্বিতীয়টা, অর্থাৎ চাওয়াটা? বাংলা ব্যাকরণ মতে, আকাশ ক্লীবলিঙ্গ, সে কথা বলতে পারে না, তাহলে সে চাইবে কেমন করে? হায় গো রবি ঠাকুর, এখন তুমি সামনে থাকলে না জানি কী ভালোই হতো। 'আকাশ আমায় ভরলো আলোয়, আকাশ আমি ভরবো গানে'— পাশের বাড়ি থেকে খুব ক্ষীণ স্বরে ভেসে আসছে। রেডিওতে বাজছে। আজ ঠাকুমা বাড়িতে নেই। 'আমার মনের রাগ রাগিনী রাঙা হল রঙিন তানে'। ইস্, ঠাকুমা থাকলে নিজের ঘরে বসেই শুনতে পেতুম। বসন্তের হাওয়ায় জানালার পর্দা উড়িয়ে নিচ্ছে। ভেসে আসছে বাতাবি লেবু ফুলের গন্ধ। 'তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে আমার হৃদয় টেনে আনে।' বিকেলের সেই রেডিওর সুর রাতে গিয়ে উপলব্ধি ঘটাল, ইথার তরঙ্গে ভেসে আসে যে গান, তাই তো আকাশের গান, আর সেই গানের জন্য আমাদের অপেক্ষা করে থাকাই, তাকে মনে মনে চাওয়া। এই না হলে রবি ঠাকুর। জীবনের সব কিছুর সঙ্গে, সব কিছুর জন্যে, তিনি আছেন।

এই রবি ঠাকুর আকাশবাণীকে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়েই ক্ষান্ত থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি। আমরা দিইনি। আকাশবাণীর মতো এক জায়গায় গীতাঞ্জলির কবি, শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠাতা, সকলের গুরুদেব যুক্ত হবেন না, এ আবার হয় নাকি? কলকাতার বেতার তখন গৌরবের সঙ্গেই চলছে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়, 'সেই সময় একদিন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, আমাদের প্রোগ্রাম পরিচালক মহাশয় বললেন, বীরেন তুমি তো সাহিত্যিকদের আড্ডায় ঘোরো, একবার রবীন্দ্রনাথকে এখানে আনতে পারো? আমি আমতা আমতা করে বললুম, নেপেনদা রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবার সৌভাগ্য আমার বহুবার হয়েছে সত্যি, তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিচিত্রা সাহিত্য বৈঠকে প্রবন্ধ, কবিতা, আবৃত্তিও দু-চারবার শুনে এসেছি...কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয় করার সুযোগ তো কখনও ঘটেনি। নেপেনদা বললেন, আরে বাপু, পরিচয়ের দরকার কী... সটান চলে যাও শান্তিনিকেতনে, সেখানে গিয়ে আমাদের আবেদনটা জানিয়ে এসো।... চলে গেলুম শান্তিনিকেতনে। ওখানে আলাপীর মধ্যে একমাত্র ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়। বিকেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললুম কি উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনে এসেছি। তিনি হেসে বললেন, বীরেনবাবু, আপনার উদ্দেশ্য এখন সফল হবে কিনা জানি না-কারণ ওঁর শরীর খুব ভালো যাচ্ছে না। তাছাড়া কিছুদিন পরেই উনি দার্জিলিং চলে যাচ্ছেন। ...এখান থেকে যদি কিছু করাতে পারেন দেখুন।'

এ স্মৃতিকথা যে সময়ের, তখন রেকর্ডিংয়ের যন্ত্র কলকাতায় এসে পৌঁছয়নি। তাই কবিকে স্টেশনে নিয়ে আসা ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না। এই সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে বেশ কয়েকটি কথা বলেন। প্রথমেই মজা করে বলেন, 'তোমাদের এই রেডিও যন্ত্রটি ভবিষ্যতে অনেক উৎপাত বাধাবে বুঝতে পারছি...।' পরে বলেন, 'আমার গানের একটা নিজস্ব সুর আছে, সেটাকে যদি কোনও শিল্পী তার খুশীমত অদল-বদল করে তাহলে মনে হয়, সকলে মিলে আমার ওপর উৎপীড়ন করছে। ও-দিকটায় একটু লক্ষ্য রেখো তোমরা।' এই ঘটনা সম্ভত ১৯৩৭ সালের। এর আগের বছর মার্চ মাসে যখন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহের জন্য দিল্লি গিয়েছিলেন, তখন দিল্লি বেতার কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বেশ কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন গুরুদেব। সেই প্রথম বেতারে কবির কণ্ঠ প্রচারিত হয়। দিল্লির সেই কবিতা আবৃত্তি কলকাতার মানুষের শ্রুতিগোচর হয়েছিল কিনা জানি না, তবে অশোককুমার সেনের ব্যবস্থাপনায় ১৯৩৮ সালের রবীন্দ্র জন্মদিনের দিন কালিম্পং থেকে কবি কণ্ঠে শোনা গেল 'জন্মদিন' কবিতা।

নাতনি নন্দিতা দেবীকে লেখা চিঠি থেকে জানতে পারা যায় ১৯৩৮ সালের ২৬ বৈশাখ অর্থাৎ জন্মদিনের পরেরদিন কবি লিখছেন, 'কাল এখানে লোক ছিল অল্প, জমেছিল বেশি। রেডিওতে আমার আবৃত্তি শুনেছিলি তো?' সে-বছর কবির জন্মদিনে কলকাতা বেতার থেকে তাঁর বিশেষ বাণী প্রচারের জন্য তৎকালীন অস্থায়ী কেন্দ্র অধিকর্তা অশোককুমার সেন কবিকে রাজি করিয়েছিলেন। সেইমতো ব্যবস্থাও শুরু হয়েছিল। জন্মদিনের কিছুদিন আগে কবি গেলেন কালিম্পং-এ। তা সত্ত্বেও কবির

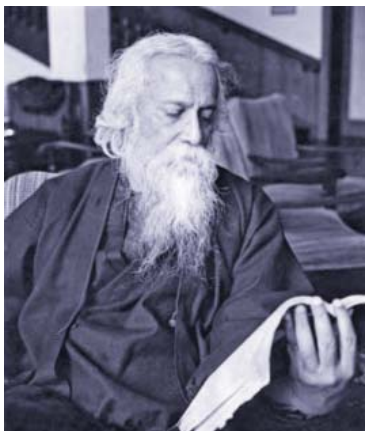

জন্মদিনের বাণী প্রচারের সিদ্ধান্তের কোনও বদল হয়নি। প্রোগ্রাম ডিরেক্টর নৃপেন মজুমদার এবং অশোককুমার সেনের তত্ত্বাবধানে কালিম্পং থেকে কবির কণ্ঠ রিলে করার ব্যবস্থা সম্পন্ন হল। অবশেষে নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হল। ঘড়ির কাটায় রাত ৮টা। ঘরে একটা বেল বেজে উঠল। কবি বসলেন যন্ত্রের সামনে। এরপর একটি লাল আলো জ্বলে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হল 'আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে, ডুব দিয়ে উঠেছে সে, বিলুপ্তির অন্ধকার হতে, মরণের ছাড়পত্র নিয়ে।' সেদিন কবিকণ্ঠ কলকাতা হয়ে কালিম্পং-এ এসে ধরা দেয়। শুধু কালিম্পং-এর মানুষ নয়, গোটা কলকাতাসী সেদিন আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়েছিল।

এই রেডিওর সঙ্গে কবির আরও অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে আকাশবাণীতে হারমোনিয়াম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ১৯৩৯ সালের জন্মদিনেও কবির বাণী প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছিল। আমৃত্যু এবং মৃত্যুর পরেও কলকাতা বেতার ছিল কবির পাশে। সেই সব গল্প নিয়ে আগামী পর্বে বেতার কথার 'কবিগুরুর বীণাপাণি' সাজাব।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৩ এপ্রিল ২০১৭

রহিমচাচার ডেরা

বীথি চট্টোপাধ্যায় (লেখিকা)

কলকাতা শহরে আমি মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াই। এটা আমার চিরদিনের অভ্যেস। কাজ থেকে যখন ছুটি পাই, তখন আমি কলকাতার এক-একটা জায়গায় বেড়িয়ে আসি। অথবা কাউকে কিছু না বলে কলেজ বা অফিস পালিয়ে, কখনও হয়তো কোনও লেখা অসমাপ্ত রেখে আমি কলকাতা ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছি ঘন ঘন। একেবারে একা হয়ে কলকাতায় বেরোই আমি। কলেজ স্ট্রিট বেড়াতে গিয়ে দেখে আসি প্রেসিডেন্সির গেটের সামনে চলছে বিক্ষোভ আর বইয়ের দোকানগুলোতে বিক্রিও চলছে স্বাভাবিক। রুদ্ধশ্বাস বিক্ষোভ আর চলমান জীবনের এমন সহাবস্থান কলকাতা ছাড়া আর কোথাও আমি দেখতে পাইনি। বই বিক্রি হচ্ছে, লেবুর শরবত বিক্রি হচ্ছে সাবলীল, তার গায়ে গা লাগিয়ে চলছে তুমুল স্লোগান, উন্মাদনা। এসব আমি দেখি। শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে দেখি কোনও প্রৌঢ় কুলি মাথায় ত্রিশ কেজি মোট ধরে আছেন তাঁর শিরা-উপশিরা ওঠা হাতে। আমি একটি রোগা কুকুরকে ডেকে খেতে দিচ্ছি দেখে ওই প্রৌঢ়টি সস্নেহে কুকুরটির বাচ্চাগুলোকে ডেকে দিলেন এদিক-ওদিক থেকে। অথচ কী প্রকাণ্ড বোঝা বইছেন ওই লোকটি। সেদিন মনটা এমন বিষাদে ছেয়ে গেল আর বেড়াতে পারলাম না। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে শপিংমল, ট্যাংরা থেকে পোস্তা— কলকাতায় আমি অনেক ঘুরেছি। টিপু সুলতান মসজিদ থেকে ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি। পার্কস্ট্রিট; ফ্রি স্কুল স্ট্রিট থেকে চিৎপুর, গ্রে স্ট্রিট— সেখান থেকে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। একেকটা জায়গায় কলকাতার মানুষের ভাষা, পোশাক, চলন-বলন একেক রকম। গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়ে সর্বস্বান্ত হতেও একসময় কী যে ভালো লাগত। আমাদের যৌবনে তো আর স্মার্টফোন, ল্যাপটপ ছিল না, গ্র্যান্ডের বলরুমে আমি প্রথম শুনি বিটোফেন! হিন্দু হস্টেলের পেছনে একটা দেশি মদের দোকান ছিল, সেখানে দেশি মদের সঙ্গে শুধু পাওয়া যেত অমৃতি আর কাঁচাগোল্লা। মদ আর মিষ্টির এই জমাটি পরিবেশন আমি অনেক পরে ইউরোপে দেখেছি। স্পেনে, পর্তুগালে। কলকাতা অনেক বদলে গিয়েছে। এটা তো হবারই কথা। কোচবিহার হোক, ওয়াশিংটন হোক সব বদলায়। আমরা নিজেরাও তো রোজই বদলে যেতে যেতে বাঁচি। কলকাতা এখন অনেক বেশি বড়লোক, কত তারকাখচিত হোটেল, কত শপিংমল। আমাদের যৌবনে নিউ মার্কেট ছিল খুব বড়লোকের জায়গা। তবে এই বদল আমার খারাপ লাগে না। আমি জানি কলকাতা আমার কতদিনের পুরনো বন্ধু। সে বাইরে যেমনই হোক, আমার সঙ্গে হুজ্জুতি করতে এখনও তার জুড়ি নেই। সে মন্দির, মসজিদ, গির্জা থেকে বেরিয়ে, ফুটপাতের দোকান বা সাউথ সিটি মল থেকে বেরিয়ে, নিউ মার্কেট, কলেজ স্ট্রিট, গ্র্যান্ডের বলরুম থেকে বেরিয়ে এসে আমার হাত ধরবে। শীত হোক, বর্ষা বা গরম হোক, আমি ঘরে ঢুকে গেলেই কলকাতা আমাকে বলবে 'বীথি, উল্লাস। চল আজ সারাদিন একসঙ্গে ঘুরে বেড়াই। আজকের দিনটা আমরা বাঁচার সমস্ত সম্ভোগ নিয়ে বাঁচি। হুররে।' অমনি আমিও বেরিয়ে পড়ব হুট করে। কলকাতার কত কী আমার আজও চেনা হয়নি, দেখা হয়নি। এদিকে আমাকেও চিনতে জানতে কলকাতার যে বাকি আছে এখনও!

(চলবে)

সময়ে থেকে কলকাতার মেসগুলি এরকম চেহারা নিচ্ছিল। শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বিশ শতকে সাতের দশকের শেষ অবধি, এই রকম মিশ্র বসবাসের ছবি পাওয়া যাবে। তবে এই সময়ের মধ্যে অনেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে চলে যায়। অবশ্য তারাই যেতে পারে, যাদের খরচপাতি আসত বাড়ি থেকে, যাদের টিউশন বা অন্যকিছু করতে হতো, তারা মেসেই থাকা পছন্দ করত। সস্তার মেসে তখন দুবেলা খাওয়া-থাকা চা-জলখাবার সব মিলিয়ে লাগত ১২০ টাকার মতো। কিন্তু সেখানে নির্দিষ্ট সময়ে ঢোকা-খাওয়া-শোয়ার নিয়ম ছিল কড়া। মেসের নিয়মে ছিল শিথিলতা। ফিরতে দেরি হয়ে গেলে, খাওয়া ঢেকে রেখে দেওয়া হতো।

বস্তির মেস কীভাবে চলত তার সুন্দর বর্ণনা আছে, সমরেশ বসুর 'বিটি রোডের ধারে' উপন্যাসে। বস্তিবাড়িতে যারাই পরিবার নিয়ে থাকত, তারা মেসে খেত না, যারা একা থাকত পুরুষ বা নারী, তারাই খেত মেসে। যাদের কাজ নেই, মেসের রান্নার দায়িত্ব তার, রান্না বলতে নিতান্ত সাধারণ, বেশিরভাগই আলুভাতে ভাত, থালা-বাসন ধোয়ার কাজ প্রত্যেকের নিজের। দুপুরে ভোজন বিরতি আর রাত্রে আটটা-নটা সময় প্রত্যেকের নিজের নিজের থালা নিয়ে রসুইয়ের বারান্দায়, এসে মাটিতে গোল হয়ে বসে খাওয়া।

বস্তিতে আলো, বাতাস, শৌচ, পানীয়ের ব্যবস্থার দিকে সরকার নজর দেয়, আইন বানায়, কিন্তু মেস ব্যবস্থায়, তেমন কোনও পরিবর্তন হয় না। অবশ্য সঙ্গে পরিবার রাখার প্রবণতা বাড়ার সাথে সাথে মেস ব্যবস্থা বস্তিতে প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যায়। তথাকথিত ভদ্রলোকদের মেসও কলকাতায় কমতে থাকে, গত শতকের আশির দশক থেকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই যানবাহনের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকায় কলকাতায় চাকরি করে শহরতলির বাড়িতে বা মফস্সলে ফিরে যাওয়ার অসুবিধে কমে আসছিল, মেসে যারা এসময় থাকত তারা সপ্তাহান্তে বা একদিনের ছুটিতে বাড়ি যেতে পারছিল। গত শতকের আশির দশকে সরকার কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য অল্পদামে ফ্ল্যাট বিক্রি করতে লাগল। আগে এ উদ্যোগ ছিল কিন্তু এ সময় তা গতি পায়। এইচডিএফসি ব্যাংক এবং আরও অন্যান্য ব্যাংক বাড়ি/ফ্ল্যাট কেনার জন্য ঋণ দিতে এগিয়ে আসে। চাকুরিজীবী যারা একদিন মেসে থাকত তারা অনেকটাই এই সুযোগ গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে বেতন কমিশনের সুপারিশক্রমে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা আর হরিপদ কেরানির মতো ছিল না, আবার ভদ্রাসনের মায়াও কেটে গিয়েছিল অধিকাংশের। অনেকে আবার দেশে যা আছে, তা রেখেও শহরে আস্তানা বানিয়েছে সন্তান-সন্ততির কথা ভেবে। তাদের পড়াশোনা, কাজ-কর্মের সুবিধা তো শহরেই। পরিবার স্থানান্তকরণ বেড়ে গেছে এই সময় থেকে। স্বভাবতই চাকরি করা মানুষের মেস-বাস ধীরে ধীরে প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে, কলকাতায়।

মূল কলকাতা থেকে মেস সরেও গেছে। দক্ষিণে যাদবপুর, উত্তরে বেলঘরিয়া এখন মেসের পীঠস্থান। তবে এই সব মেসে যারা থাকে, তারা পড়ুয়া। তাও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় বিভিন্ন কোচিং বা ট্রেনিং সেন্টারে চাকরির পরীক্ষায় প্রস্তুতি নেওয়া বেকার পড়ুয়াদের সংখ্যাই হয়তো বেশি। এই মেসগুলি কোনওটাই বড় নয়, জনা কুড়ির মতো থাকতে পারে এমন মেসের সংখ্যা হাতে গোনা যাবে। অধিকাংশ মেসেই রান্নার লোক রাখা, বাজার দোকান, সাফসুতরো রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি করতে হয় আবাসিকদের নিজেদেরই। সপ্তাহ বা মাস ভাগে পালা করে এগুলো করে তারা। মেসের যিনি মালিক তিনি শুধু ভাড়া নেন, বিনিময়ে বিদ্যুৎ জল ও চৌকির ব্যবস্থা করেন তারও দাম ধরে নেওয়া হয়। আসলে এইসব মেসগুলো ঠিক মেসবাড়ি নয়, মালিক তার উদ্বৃত্ত গৃহ বা গৃহাংশে পরিবার ভাড়া না দিয়ে তরুণ ভাগ্যান্বেষণ বা পড়ুয়াদের ভাড়া দেয় মাত্র। এতে তাদের অর্থকরী লাভ বেশি। ৭/৮ ফুটেই ভাড়া পাওয়া যায় ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা। সেক্ষেত্রে একটা ১০/১১ ফুটের ঘরে আয় হবে ৪৫০০ টাকা। অস্বাস্থ্যকর অধিকাংশই, অধিকাংশই নিরানন্দ সময় পাতের চেয়ে বেশি কিছু নয়, কিন্তু গরজের দান লক্ষ টাকা।

লেখক চাপরা বাঙালঝি মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ৩ এপ্রিল ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

এ যেন আমার নিজের শহর

শাওনায়াজ ইসলাম রবি (চিত্রশিল্পী)

কলকাতার সাথে আমার হৃদয়ের যোগাযোগটা বড় নিবিড়। তাই কলকাতা নিয়ে কিছু বলতে গেলে, লিখতে গেলে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। '৯৭-র শেষ, তখন দারুণ শীত। মনে আছে আমার ছোট মেয়ে আরিফা ভীষণ অসুস্থ। এদেশের ডাক্তারেরা হাল প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। সে-সময় আমার খুব প্রিয়বন্ধু তাইজুল মেয়েকে নিয়ে ওদেশে আসতে বলে। আরিফা তখন দমের কষ্টে হাঁসফাঁস করছে। আমি ওকে বললাম, মা আরিফা আমরা কলকাতায় যাবো। ওদেশে খুব বড় বড় ডাক্তারবাবু আছেন। তোমায় সুস্থ করে দেবেন'। আরিফা চুপ করে রইল। তবে এটা বুঝতে পারছিলাম ওর মুখের হাসি আর চোখের চাহনিতে একটা অদ্ভুত আকুতি। তাই হাজার অর্থকষ্ট থাকলেও আরিফাকে বুকে জড়িয়ে প্রথমবার দেশ ছেড়ে বিদেশে এলাম, তাও আবার কলকাতায়। তখন মনের মধ্যে একই সঙ্গে অদ্ভুত রকমের আবেগ আর মেয়েকে বাঁচানোর যুদ্ধ। সে স্মৃতি আজও ভোলার নয়। শিয়ালদহ নেমে বন্ধু তাইজুলকে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরি। চোখে জল ভরে আসে। তাইজুল আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে, ফল হয় না। শেষে আরিফার কথা ভেবে নিজেকে শক্ত করি। ওর জন্যই তো, ওকে বাঁচাতেই কলকাতায় আসা। হসপিটালে ভর্তি করা হয় ছোট্ট আরিফাকে। দীর্ঘ সাতাশ দিন হসপিটালের বেডে শুয়ে লড়াই চালায় আরিফা। সবশেষে ডা. শান্তনু সেনের সুচিকিৎসায় আস্তে আস্তে সুস্থ হতে থাকে আমার আরিফা। বাবা হওয়ার গর্ব, মেয়েকে বাঁচানোর আনন্দ চিত্রকর শাওনায়াজ ইসলাম রবিকে বাবা শাওনায়াজ হয়ে ওঠার আনন্দ দেয় কলকাতা। সত্যি বলতে কী আজ যে আরিফা সুস্থ আছে, তার বিয়ে শাদি সবই তো কলকাতার দান।

পরেরবার ২০১২-তে কলকাতা গেলাম চিত্রপ্রদর্শনী করতে নন্দনে। কলকাতা ও ঢাকার ১৮জন শিল্পীর ছবি নিয়ে দু'দিনের প্রদর্শনী চলে। বাংলাদেশ থেকে আমরা যে ১২জন শিল্পী এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিলাম, তাদের বেশিরভাগই আস্তানা গেড়েছিল মারকুইস স্ট্রিটে। সেবার বহু লেখক-কবি, চিত্রশিল্পীদের সাথে পরিচয় হয়। এছাড়াও বহু মানুষের ভালোবাসা যেমন পেলাম, তেমন পেলাম নতুন প্রেরণা। প্রেরণা বলছি এই কারণে, ওখানকার ছোট-বড়র মেলবন্ধন আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। নীলেশ নামের ছেলেটি, ও আঁকে না কবিতা লেখে। ওর কবিতার ভাষা-সারল্য ছুঁয়ে যায় আমার মনকে। কথায় কথায় জানতে পারি নীলেশ 'শব্দ' পত্রিকা সম্পাদনা করে। ওর মতো বয়সে ওর মতো সাহসী কবিতা সরলভাবে কখনও আর কাউকে লিখতে দেখিনি। তার সাথে অসমবয়সি বন্ধুত্ব বেশ জমে ওঠে। ওর সাথে প্রথম গঙ্গার পাড় ঘুরি। মন শান্ত হয়ে আসে। তারপর ওর সাথে দেখে নিই কলকাতার অলি-গলি। ওর সাথেই আমি আর আমার এক ফোটোগ্রাফার বন্ধু ওয়াশিকুর সায়েন্স সিটি থেকে জাদুঘর, ভিক্টোরিয়া থেকে গড়ের মাঠ ঘুরে বেড়াই। ভিক্টোরিয়ার সবুজ ঘাসের ওপর থেকে যাওয়ার সময় বারে বারে মনে হচ্ছিল, আমি সবুজ গাছের মতোই সেজে উঠছি রঙিন কলকাতার প্রতিটি শাখা-প্রশাখায়। আমি কবি নই, কবিতা আমার জন্য নয়। তবুও সেদিন কলকাতায় মনে হয়েছিল কবিতা আমাকে জাপটে ধরতে চাইছে। আকাশে আধফালি চাঁদও ছিল। পরম তৃপ্তি পাচ্ছিলাম। কখনওই মনে হচ্ছিল না, ঢাকা ছেড়ে দূরে অন্য কোথাও এসেছি। পরে কাজের সূত্রে অন্য দেশের অনেক শহরেও গেছি। তবে কলকাতার মতো এত নিজের করে অন্য শহরকে নিতে পারিনি কখনও। এ যেন আমার নিজের শহর।

পরেরদিন বিকালে নীলেশের অনুরোধে ওর বাড়িতে যেতে হয়েছিল। বন্ধু তাইজুলকে ফোন করে রেখেছিলাম। সময়মতো হাজির হলাম দু'জনে। অনেক আড্ডা হল। নীলেশ তার নতুন লেখা কবিতা শোনাল। আমিও সেদিন আমার আঁকা প্রিয় ছবিগুলির একটি তাকে উপহার হিসাবে দিলাম। তারপর একটু সন্ধ্যা হতে আমরা তিনজন (আমি, তাইজুল ও নীলেশ) কলেজ স্ট্রিট-এর পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে যাচ্ছিলাম বইয়ের সমারোহে। তবে আফসোস একটাই কফি হাউসে যাওয়া হয়নি। মেঘ-বৃষ্টি-ঝড় বাধ সাধে। তবে বন্ধু নীলেশ কথা দিয়েছে পরেরবার কলকাতা গেলে ও আমাকে সবার আগে কফি হাউস নিয়ে যাবে... আমিও সে অপেক্ষায় আছি নীলেশ।

রাণী চন্দ ও তাঁর নন্দন জগৎ

নীলাঞ্জন

'সে ছিল এক নন্দনের জগৎ'। এই পাঁচটি শব্দের পর শুধুই নীরবতা। আর কোনও কথা শোনা যেত না তাঁর কাছে। তাঁর শিল্পকর্মের কথা নিভৃতেই রয়ে গেছে। সে সব সম্পর্কে বিশেষ একটা আলোচনা বা চর্চার কথা জানাননি। অথচ তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী হয়েছে। বম্বে ও দিল্লি সহ ভারতের প্রধান শহরগুলিতে। এছাড়াও দেশের অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে আয়োজিত সম্মিলিত প্রদর্শনীতেও রাণী চন্দের আঁকা একাধিক ছবি স্থান পেয়েছিল। দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবন সহ বিভিন্ন রাজভবনে তাঁর শিল্পকর্ম সংগহ করে রাখা আছে। তাঁর জীবনে শিল্পকর্মের বীজ রোপিত হয়েছিল ধলেশ্বরী নদীর তীরে মামার বাড়ির গ্রামে। মা পূর্ণশশী এবং দিদিমার হাতের কাজ তখন থেকেই রাণীকে আকর্ষণ করত। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গে শ্যামলী প্রকৃতি তাঁকে কৈশোর থেকেই শিল্পী করে গড়ে তুলেছিল। তবে লেখিকা হিসেবেই তিনি সকলের পরিচিতা। তিনি না থাকলে রবীন্দ্র জীবনের শেষ বছরগুলির দিনপঞ্জী কবি-কল্পনার কথা জানা যেত না। বাবা কুলচন্দ্র দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বড়দা মুকুলচন্দ্র দে ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। সেই বড়দার সঙ্গেই রাণী চন্দের প্রথম আশ্রম যাত্রা এবং রবীন্দ্রনাথকে দর্শন। রাণীর আজীবন মনে ছিল তাঁর প্রতি কবির প্রথম সম্ভাষণের কথা। 'কে এল আমার আকন্দ নিয়ে আমায় উপহার দিতে।'

১৯২৭ সালের সেই শান্তিনিকেতন ভ্রমণের মাধ্যমে রাণী চন্দের যেন নবজন্ম হল। জন্ম এবং কৈশোর কেটেছিল ওপার বাংলায়। এরপর শান্তিনিকেতনই হয়ে উঠল তাঁর কাছে সব পেয়েছির দেশ। ১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে উঠেছিলেন আর্ট কলেজে মুকুল দের কোয়ার্টারে। রাণীরও সুযোগ হয়ে যায় তাঁর প্রিয় গুরুদেবকে আরও কাছে পাওয়ার। সারাদিন তিনি তন্ময় হয়ে দেখেন রবীন্দ্র চিত্রকলার সৃষ্টি। কবি ছবি আঁকেন আর বালিকা রাণী কাছে এসে বসেন। পরবর্তীকালে রাণী চন্দ তাঁর এক জীবনীমূলক গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'গুরুদেবের বেশির ভাগ ছবিই আমার চোখের সামনে আঁকা। আজও বলে দিতে পারি কখন কোন ছবি কোথায় বসে এঁকেছেন। আঁকতে বসে কী বলেছেন-কোন মুডে এঁকেছেন।' ছবি আঁকার মাঝে কখনও কখনও কবি রাণীকে পড়াতেন 'ফ্রিসেন্ট মুন'। চৌরঙ্গীর আর্ট কলেজে বাস সাঙ্গ করে কবি অল্প কিছু সময়ের জন্য ফিরে গিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর মহর্ষিভবনে। এরপরের গন্তব্য শান্তিনিকেতন, কিন্তু এবারে আর একা নন। সঙ্গে নিলেন দুই বোন রাণী আর অন্নপূর্ণাকে। আশ্রমে রাণীর ঠাঁই হল কলাভবনে। ললিত কলার এই তীর্থ ক্ষেত্রে নন্দনতত্ত্বের পাঠ নেওয়া শুরু করলেন নন্দলাল বসু এবং বিনায়ক মাসুজির কাছে। শান্তিনিকেতনের বাঁধন হারা জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই শিক্ষা, ক্লাসের বাইরেও পথ চলতে চলতে শেখা। মাস্টারমশাই নন্দলাল রাণীকে বুঝিয়ে দেন ছন্দ আর রসের পার্থক্য। এরপর রাণী দে হলেন রাণী চন্দ। কবির ব্যক্তিগত সচিব অনিল চন্দের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

তুলি আর কলম ছিল রাণীর জীবনের নিকটতম সঙ্গী। রঙের সঙ্গে যেমন ছিল তাঁর অন্তরের যোগাযোগ তেমনই কলমের সঙ্গেও ছিল তাঁর নিবিড়তম সম্পর্ক। ছবি আঁকার পাশাপাশি শুরু হল লেখা। রবিকার আদেশে অবন ঠাকুর বলতে শুরু করলেন ঠাকুর বাড়ির অতীত যুগের কথা। অবনীন্দ্রনাথ বলেন আর রাণী লেখেন। এইভাবেই সৃষ্টি হল 'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর ধারে'। যতদিন যেতে লাগল ততই রাণীর হাত তৈরি হতে থাকল। জলরং, টেম্পারা, উডকাটে। সৃষ্টি হল বৌদ্ধভিক্ষু ছাত্র, কোণার্কের গায়ে নীলমণি লতা, কুয়োর ছবি, তিন সখীর মতো বহু ছবি। অবন ঠাকুরও যৌথভাবে অনেক ছবি এঁকেছেন রাণীর সঙ্গে। প্রতিদিনকার যৌথ এই চিত্রসাধনার নাম 'দুর্গানাম জপ', দিয়েছিলেন অবনীনন্দ্রনাথ। তাঁদের সেই সব শিল্পকর্ম মানুষ আর দেখতে পেল না। রাণীর শেষবেলাকার নীড় 'জিৎভূম' থেকেই হারিয়ে গেল সব শিল্পকর্ম। নন্দলাল বসুর মতো অবন ঠাকুরও রাণীকে আর্টের বিষয়ে নানান শিক্ষা দিতেন। ছবির ক্রুডনেস, স্ট্রেন্থ নিয়েও হরেকরকম তথ্য দিতেন।

তাঁর কলমের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল 'গুরুদেব', 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ', 'হিমাদ্রী', 'পূর্ণকুম্ভ'। রচনা করেছিলেন অন্য স্বাদের বই যার মধ্যে ছিল 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ', 'আমার মা-র বাপের বাড়ি', 'জেনানা ফটক' ইত্যাদি। পণ্ডিত নেহরুর জন্মশতবর্ষে গিয়েছিলাম জিৎভূমে। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন আর্টের সম্পর্কে সাক্ষাৎকার নিতে। কিন্তু স্মৃতি তখন তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। নীরব দৃষ্টি বলতে চেয়েছিল অনেক কিছু, কিন্তু বলা হয়নি। তাঁর না বলা বাণীকেই খুঁজে পেয়েছিলাম বইয়ের ভিতরে। ১৯৫৪ সালে 'পূর্ণকুম্ভ' গ্রন্থের জন্য পেয়েছিলেন রবীন্দ্র পুরস্কার। সমগ্র সাহিত্যকীর্তির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট দিয়ে সম্মানিত করে। জীবন সায়াহ্নে রচিত শেষগ্রন্থ 'সব হতে আপন'-এ প্রিয় গুরুদেব এবং শান্তিনিকেতনের প্রতি প্রণতি জানিয়ে লিখেছিলেন, 'ভিজে পাতা সাড়া তোলে না, চুপ হয়ে যায়।'